سورة المنافقون

সূরা মুনাফিকুন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝١ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ
جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝٣ وَإِذَا
رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۝٥
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَن يَغْفِرَ
اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝٦ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝٧ يَقُولُونَ لَئِن
رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলেঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না; পরিণামে তারা আপনা আপনি সরে যাবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলেঃ আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সা)। আল্লাহ্ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক---আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথসমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) ঢালরূপে ব্যবহার করে। (কেননা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত---তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও লুন্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিষ্টের সাথে একটি সংক্রামক অনিষ্টও রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে, অতঃপর (তাদের শয়তানদের কাছে যেয়ে إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ---এই কুফরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘন্যতম কুফর)। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহ্যত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাঞ্জল ও মিষ্টি হওয়ার কারণে) শুনেন, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসারশূন্য, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিশাল বপু, কিন্তু নিষ্প্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনিভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আভাসে-ইঙ্গিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শত্রু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুষ্টুমির অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে] এসো, আল্লাহ্র রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুফরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলেঃ যারা আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরেট মূর্খতা; কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলারই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই রিযিকের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলেঃ আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহ্র (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।---(মাযহারী) ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছুলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্খতা যুগের শ্লোগান ঃ কিন্তু এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية — অর্থাৎ এ কি মূর্খতা যুগের আহবান! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন ঃ دعوها فانها منتنة এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা---সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম।

এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমের হাত চেপে ধরা---সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বক্তৃতা শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম, তুই-ই দুর্বল, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে ওযর পেশ করে বলল : আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : বৎস! দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্

(সা) আবার বললেনঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রা) বললেনঃ আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেনঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেনঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বললঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবূল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশছলে বললেন ঃ তুই এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রা) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين فى ابن ابى من اولها الى اخرها -

অর্থাৎ হে বালক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে'---এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?---রসূলুল্লাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললঃ আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছেঃ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্রকে বললেনঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেনঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ "রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্য নারীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ ঃ উপরোক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই ঃ

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন ঃ বনিল মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী মাপকাঠি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরোক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে অকুস্থলে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্গন্ধযুক্ত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে ঃ

—تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপকাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ মূর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয়----আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজাযী, ইয়ামনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ্ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআনের মূলনীতি ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা ঃ উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের শ্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হুঁশিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত

এবং সম্ভ্রম এমনই বদ্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিবৃতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সম্ভ্রম কেবল আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্ছিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয়ঃ

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ سرو و سمن
همہ ز خویش برید ند و با تو پیو ستند

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

هزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد
خدائے یک تن بیگانہ کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্বঃ এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসূলুল্লাহ্ (সা) মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশংকা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ—মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে সিজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি---শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।---(মাযহারী)

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا—

জাহ্জাহ্ মুহাজির ও মিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ স্থলে لَا يَفْقَهُوْنَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ—

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযত ওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُونَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

---

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ো না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে। لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছেঃ) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ---এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ব-বৃহৎ---ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়---ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।---(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে।

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ — এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্র স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধনসম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে ---অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। أَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِينَ —অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎ কর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।
